সূচিপত্র

পূর্বাভাস
পর্ব ১ : যা হবার কথা, যা হচ্ছে
১. বিজ্ঞান যেভাবে কাজ করে
২. রেপ্লিকেশন-সংকট
পর্ব ২ : ভুল আর কলঙ্ক
৩. জোচ্চুরি
৪. গোঁড়া
৫. গাফিলতি
৬. হুজুগ
পর্ব ৩ : কারণ ও প্রতিকার
৭. মতলবে ভুল
৮. বিজ্ঞান সংস্কার
৯. শেষ কথা
১০. সংযুক্তি
গবেষণা-পত্র যেভাবে পড়বেন

Stack Valy

পূর্বাভাস

৩১ জানুয়ারি, ২০১১। অদ্ভুত এক ঘটনার সাক্ষী হলো পৃথিবী। দুনিয়া জানল অনার্স-পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের অলৌকিক ক্ষমতার কথা।

অনেক নামকরা পত্রিকা সেদিন প্রথম পাতায় বড় বড় হরফে ছাপাল এক বিজ্ঞান গবেষণা-পত্রের খবর। গবেষণা-পত্রটি জানাল প্রায় হাজার খানেকের বেশি লোকজনকে নিয়ে একটা পরীক্ষা করা হয়েছে। পরীক্ষায় দেখা গেছে, এসব লোকজন আশ্চর্যজনকভাবে অজানা খবর বলে দেয়! মানুষের চিরচেনা পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের বাইরে অন্য কিছু একটার ব্যবহার বুঝি তারা জানে। সেটা ব্যবহার করেই তারা ভবিষ্যতের খবরাখবর বলে দিচ্ছে!

আবিষ্কারটা সত্যিই প্রথম পাতায় আসার মতো। তবে গবেষণাটা আরও বেশি নজর কেড়েছে এর গবেষকদের কারণে। গবেষণাটির মূল হর্তাকর্তা ছিলেন কর্নেল ইউনিভার্সিটির মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক ড্যারিল বেম। তার ওপর আবার সেই গবেষণা-পত্রটি ছাপা হয়েছে মূলধারার পিয়ার-রিভিউ-হওয়া মনোবিজ্ঞান জার্নালে। ভবিষ্যতের কথা জানাকে এত দিন বিজ্ঞান অসম্ভব বলেই মানত। কিন্তু এই গবেষণা বিজ্ঞানের পুরাতন সে বিশ্বাসকে একেবারে পালটে দিলো। বিজ্ঞান এখন বিশ্বাস করে, ভবিষ্যৎ জানা সম্ভব।

আমি তখন পিএইচডি স্টুডেন্ট। এডিনবোরা ইউনিভার্সিটিতে সাইকোলজি নিয়ে পড়ছি। খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বেমের গবেষণা-পত্রটা পড়লাম। আপনাদের আমি সেখান থেকে একটা পরীক্ষার কথা বলি।

অনার্স-পড়ুয়া একদল শিক্ষার্থীকে মনিটরের সামনে বসানো হয়েছে। মনিটরে কিছুক্ষণ বাদে দুটো পর্দার ছবি আসবে। তাদের বলা হয়েছে, দুটোর একটার পেছনে আরেকটা ছবি আছে। তাদের এখন আঁচ করতে হবে সেই তৃতীয় ছবিটা কোন পর্দার ছবির পেছনে আছে। যে-পর্দার ছবির পেছনে তৃতীয় ছবিটা থাকবে বলে তারা ধারণা করবে, তারা সেই পর্দার ছবিতে ক্লিক করবে—মানে পুরোটাই আন্দাজে। ক্লিক করার পরই শুধু জানা যাবে কার অনুমান ঠিক।

এই পরীক্ষাটা ওরা ৩৬ বার করলেন।

ফলাফলটা দেখুন কেমন অদ্ভুত। গবেষণা বলছে, পর্দার ছবির পেছনে চেয়ার-টেবিলের মতো ম্যাড়ম্যাড়ে জিনিস থাকলে স্টুডেন্টদের সাফল্যের হার ৫০%। নিখুঁতভাবে বললে, ৪৯.৮%। যেন কোনো কয়েন টস। কিন্তু পেছনে যদি যৌন-উত্তেজক কোনো ছবি থাকে, তখন স্টুডেন্টদের সাফল্যের হার কিন্তু বেড়ে হয়ে যায় ৫৩.১%। সংখ্যাটা পরিসংখ্যানের বিবেচনায় বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটা থ্রেশোল্ড পয়েন্টের ওপরে। থ্রেশোল্ড পয়েন্ট মানে ন্যূনতম যতখানি সম্ভাবনা থাকলে একটা সংখ্যা পরিসংখ্যানের বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

Stack Valy

গবেষক বেম শিক্ষার্থীদের এমন অলৌকিক ক্ষমতার কারণ দর্শালেন। তিনি বললেন, মানুষের মধ্যে অবেচতন এক যৌন চাহিদা থাকে। এটাই খুব সম্ভবত একটু করে হলেও স্টুডেন্টদের প্রভাবিত করেছে। যে-কারণে যৌন-উত্তেজক ছবিটা কোন পর্দার ছবির পেছনে আছে সেটা তারা অনুমান করে বলে দিতে পেরেছে।

বেমের এই গবেষণা-পত্রে আরও যেসব পরীক্ষার কথা বলা আছে ওগুলো এত ভেঙে বলা নেই। কিন্তু পরীক্ষাগুলোর যে-বিবরণ তিনি দিয়েছেন, দেখলেই বুঝবেন একেকটা পরীক্ষা কী পরিমাণ হেঁয়ালিতে ভরা।

যেমন আরেকটা পরীক্ষার কথা বলি। মনিটরে এক এক করে মোট ৪০টা শব্দ আসছে। শব্দগুলোর একটার সঙ্গে আরেকটার কোনো সম্পর্ক নেই। ৪০টা

শব্দ আসার পর এখন মেমোরি টেস্ট হবে। স্টুডেন্টরা ৪০টা থেকে কয়টা শব্দ মনে রেখেছে সেগুলো তাদের লিখতে হবে। মনিটরে এখন কম্পিউটার নিজের মতো ২০টা শব্দ বাছাই করে দেখাবে।

পরীক্ষা শেষ।

বেম বলছেন, মনিটর যে ২০টি শব্দ পরে দেখাবে শিক্ষার্থীরা আগেই সেটা বলে দিচ্ছে। অথচ এটা কিন্তু তাদের জানার কথা নয়। তার মতে, এটা অবশ্যই স্টুডেন্টদের অতিলৌকিক কোনো ক্ষমতা।

এই পরীক্ষাটা কী রকম দেখুন। কেউ পরীক্ষার জন্য একরকম প্রস্তুতি নিল। তারপর পরীক্ষা দিলো। পরীক্ষার পর আবার পড়াশোনা করল। যেহেতু সে এখন প্রশ্নপত্র জানে, সে শুধু ওগুলোই পড়ল। তো, স্বাভাবিক—সে যদি আবার পরীক্ষা দিতে পারত, তার এবারের পরীক্ষা অবশ্যই প্রথমবারের পরীক্ষার চেয়ে ভালো হতো। কিন্তু দেখা গেল, দ্বিতীয়বার পরীক্ষা না দিয়েও তার আগের দেওয়া পরীক্ষার রেজাল্ট ভালো হলো! তার মানে, পরীক্ষা দেবার পর সে যে পড়াশোনা করেছে, ওটাই তার ওই পরীক্ষার ফল পালটে দিয়েছে!

এর মানে কী আসলে? পদার্থবিজ্ঞানের সব সূত্র কি ওলট-পালট হয়ে গেল? সময় কি এখন দুদিকে চলে? ফলাফল আগে আসে, কাজ পরে হয়?

বেমের গবেষণার কারণে কিন্তু এসব উদ্ভট কথাবার্তাই খবরের কাগজের প্রথম পাতায় রাজ করল কয়েক দিন।

বেমের পরীক্ষাগুলো কিন্তু খুব সাদামাটা। একটা ডেস্কটপ কম্পিউটার ছাড়া আর কিছুই লাগে না। আমার মতো যেকোনো পিএইচডি স্টুডেন্ট চাইলেই তার পরীক্ষাগুলো নিজে নিজে করে দেখতে পারবে। বেমের আবিষ্কার সত্য না ভাঁওতা নিজেই প্রমাণ পাবে।

আমি ঠিক করলাম আমি বেমের পরীক্ষাগুলো নিজে করে দেখব। এ কাজে সাথে পেলাম আমার মতো সন্দিহান আরও দুজন মনোবিজ্ঞানীকে। বেমের

পরীক্ষার ফল নিয়ে তাদের মনেও সন্দেহ। এদের একজন হার্টফোর্ডশায়ার ইউনিভার্সিটির রিচার্ড ওয়াইজম্যান। আরেকজন গোল্ডস্মিথস ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের ক্রিস ফ্রেঞ্চ।

বেম শব্দ-তালিকার যে-পরীক্ষা করেছিলেন, আমরা ঠিক করলাম প্রথমে ওটা করব। সবাই আমরা যে যার বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবে পরীক্ষাটা চালাব। আমরা তিনবার চালালাম পরীক্ষাটা।

কয়েক সপ্তাহ বাদে আমরা গবেষণার ফল নিয়ে বসলাম। আমরা খুবই হতাশ। গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অলৌকিক কোনো ক্ষমতার ছিটেফোঁটাও পেলাম না। তার মানে, পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলো বদলায়নি।

আমরা গবেষণার ফল নিয়ে একটা গবেষণা-পত্র লিখলাম। এরপর সেটা সোজা পাঠিয়ে দিলাম *দা জার্নাল অব পার্সোনালিটি অ্যান্ড সোশাল সাইকোলজি* জার্নালে। বেমের গবেষণাটা ওখানেই ছাপা হয়েছিল।

Stack Vary

কিন্তু কী তাজ্জব ব্যাপার—দুদিন যেতে না যেতেই আমাদের মুখের ওপর যেন দরজা ধড়াম করে বন্ধ করে দেওয়া হলো। জার্নালের সম্পাদক আমাদের গবেষণা-পত্র ফিরিয়ে দিলেন। বললেন, আমাদের গবেষণা-পত্র তাদের পত্রিকার নীতির বিরুদ্ধে যায়। তাদের নীতি হচ্ছে, আগের গবেষণা-পত্রে যে-পরীক্ষা হয়েছে, পরে যদি আবার সেসব পরীক্ষা কেউ নতুনভাবে করে গবেষণা-পত্র পাঠায়—ফলাফল যা-ই আসুক—তারা সেটা ছাপান না।

পাঠক, আপনারাই বলুন, আমাদের তখন কেমন লাগছিল!

বিজ্ঞান-পত্রিকাটি এমন একটা গবেষণা-পত্র ছাপল, যেখানে কিছু মারাত্মক দুঃসাহসী বক্তব্য এসেছে। এসব বক্তব্য সত্য হলে সেটা তো শুধু মনোবিজ্ঞানের জন্যই ইন্টারেস্টিং হতো না—বরং পুরো বিজ্ঞান জগতে নতুন হাওয়া নিয়ে আসত। এই গবেষণা-পত্রের ফলাফল জনসমুখে সগৌরবে এসেছে। গণমাধ্যমে এসেছে। 'দা কলবার্ট রিপোর্ট' নামে এক লেট-নাইট টক-শোতে বেম নিজে পর্যন্ত এসেছেন এই গবেষণার ফল নিয়ে কথা বলতে।

অথচ একই প্রক্রিয়া মেনে গবেষণা করে আগের ফলাফলকে যে-গবেষণা-পত্র প্রশ্নের মুখে ফেলল—এডিটর সেটাকে আমলেই নিলেন না। এ-ই হচ্ছে এখনকার বিজ্ঞান-চর্চার বাস্তবতা।

আজকালকার বিজ্ঞান-চর্চা যে কোথায় নেমেছে তার আরেকটা নমুনা দেখুন।

পর্ব ১

যা হবার কথা, যা হচ্ছে

১. বিজ্ঞান যেভাবে কাজ করে

আপনি ল্যাবে বসে বসে নিরিবিলি কিছু একটা পর্যবেক্ষণ করেছেন। আপনার পর্যবেক্ষণ যে বাস্তব, সেটা অন্য বিজ্ঞানীদের বোঝাতে হবে। তাদের আশ্বস্ত করতে হবে। আর এখানেই বিজ্ঞানের সামাজিক দিকটা।

গত শতাব্দীর আগে পিয়ার-রিভিউয়ের চর্চা হতো না সবখানে। পিয়ার-রিভিউ করা হবে বলে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন তো তার একটা গবেষণা-পত্রই ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। ১৯৩৬ সালে *ফিজিকাল রিভিউ* নামে এক জার্নালে তিনি একটি গবেষণা-পত্র পাঠিয়েছিলেন। পরে জানতে পারলেন ওটা নাকি অন্য এক পদার্থবিজ্ঞানীর কাছে পাঠানো হয়েছে মতামতের জন্য। তার কাছে মনে হয়েছিল এ কাজটা তার জন্য রীতিমতো মানহানিকর।

এই তো মাত্র অর্ধ-শতাব্দী আগে সত্তরের দশকে গিয়ে পিয়ার-রিভিউ একটা আনুষ্ঠানিক মাত্রা পায়।

যারা পিয়ার-রিভিউ করেন, তাদের পরিচয় সাধারণত গোপন থাকে। এটা একদিকে যেমন বর, অন্যদিকে আবার শাপ।

বর কারণ রিভিউকারেরা স্বাধীনভাবে তাদের মতামত দিতে পারেন। যার কাজ নিয়ে সমালোচনা করছেন, তার থেকে পালটা কোনো প্রতিক্রিয়ার ভয় থাকে না। একজন জুনিয়র সায়েন্টিস্ট নির্দ্বিধায় সিনিয়র সায়েন্টিস্টের কাজ নিয়ে

কথা বলতে পারেন। আবার এই একই কারণে এটা শাপ। কারণ, রিভিউকারীর মনে তো কোনো ভয় কাজ করছে না। তিনি যা ইচ্ছে তা বলে দিচ্ছেন লাগামছাড়া। নিচের কিছু পিয়ার-রিভিউয়ের মন্তব্য দেখলেই বুঝবেন এই কথাটা কেন বললাম :

—'কোনো কোনো পেপার পড়তে মজা লাগে। এটা একদমই সেরকম কিছু নয়।'

—'এই গবেষণার ফল মাকড়সার জালের মতো দুর্বল।'

—'পাণ্ডুলিপিতে তিনটা দাবি আছে। প্রথমটা আমরা অনেক বছর ধরেই জানি। দ্বিতীয়টা জানি কয়েক দশক ধরে। আর তৃতীয়টা জানি শতাব্দী ধরে।'

—'আমরা ধারণা, এই ম্যানুস্ক্রিপট এই ফিল্ডকে এগিয়ে নিতে তো কোনো অবদান রাখবেই না; বরং আরও পেছাবে।'

Stack Valy

—'এই বাক্যটা লেখার সময় কি আপনার মৃগীরোগ হয়েছিল? কারণ, পড়ার সময় আমার হচ্ছে।'

যাক সে কথা। রিভিউকারীর মন্তব্য এমন হলে সেই গবেষণা-পত্র নির্ঘাত বাতিল। তখন আপনি হয়তো এই গবেষণা নিয়ে হাল ছেড়ে দেবেন। অথবা অন্য কোনো জার্নালে যোগাযোগ করবেন। তারাও যদি বাতিল করে, তা হলে অন্য কোনো জার্নালে যাবেন। এভাবে চলতে থাকবে। তারপর একসময় হয়তো নিম্ন-মর্যাদার কোনো জার্নাল আপনার গবেষণা-পত্র ছাপাতে রাজি হবে।

রিভিউকারীদের মন্তব্য পজিটিভ হলে আপনি আপনার কাজের সংশোধন-পরিমার্জনের সুযোগ পাবেন। হয়তো কোনো পরীক্ষা ফের নতুন করে করতে হবে। হয়তো কোনো জায়গা নতুন করে লিখতে হবে। তারপর আবার সেটা পাঠাতে হবে সম্পাদক বরাবর। সম্পাদক ফের ওটা রিভিশনের জন্য পাঠাবেন। এভাবে দেওয়া-নেওয়া চলতে থাকবে আরও কয়েক মাস।

একপর্যায়ে সব ঠিকঠাক হবে। আপনার গবেষণা-পত্র অবশেষে আলোর মুখ দেখবে।

বিজ্ঞান-পত্রটি হার্ডকপিতে বের হলে আপনি ছাপার অক্ষরে আপনার গবেষণা-পত্রটি দেখার মজা পাবেন। আর না হলে জার্নালের ওয়েবসাইটে দেখে ক্ষান্ত থাকতে হবে।

যাক—আপনার কাজ শেষ! বিজ্ঞান-সাহিত্যের জগতে আপনার নাম এসেছে। আপনি এবারে এই কাজের কথা আপনার সিভিতে দিতে পারবেন। অন্য গবেষকেরা আপনার গবেষণার উদ্ধৃতি দিতে পারবেন। আপনি এবার বাকি দিন নাকে তেল দিয়ে ঘুমোতে পারেন!

তো, মোটের ওপর কাজটা এরকমই চলে। কোথাও কমবেশি হতে পারে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই যে এত টানাহেঁচড়া হয়ে একটা গবেষণা ছাপা হলো, সেটা কি কোনো নির্ভরযোগ্য ফল দেখাল আমাদের?

StackValy

২. রেপ্লিকেশন-সংকট

ধরুন, আপনি একটু পরে ইন্টারভিউ দেবেন। বা ওরকম কোনো সঙ্কটময় পরিস্থিতি। আপনি দুটো মিনিট সময় নিন। নিরিবিলি কোথাও গিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে দাঁড়ান। দুই পা দুই দিকে ছড়ানো থাকবে। হাত দুটো কোমর ধরে থাকবে। এতে আপনি মানসিকভাবে চাঙা হবেন।

২০১০ সালে কাডি আর তার সহকর্মীরা এই বিষয়ে এক গবেষণা করেছিলেন। তারা দেখেছেন, যাদের বলা হয়েছিল হাত গুটিয়ে বা সামনে ঝুঁকে বসতে, তাদের চেয়ে পাওয়ার পোজে দাঁড়ানো লোকজনের মনের জোর বেশি ছিল। জুয়া খেলায় এদের ঝুঁকি নেওয়ার সাহস বেশি হয়েছিল। এদের মধ্যে টেস্টোস্টেরন হরমোনের মাত্রা বেড়েছে। স্ট্রেস হরমোন কর্টিসলের মাত্রা কমেছে।

মাত্র দুই মিনিটের পাওয়ার পোজ আপনার জীবনকে তুমুল নাড়া দেবে—কাডির এই কথা লুফে নিয়েছিল মানুষজন। টেড টক ভিডিও দেখার তালিকায় তার ওই ভিডিওর ক্রম ছিল ২! সাত কোটিরও বেশিবার দেখা হয়েছে এই ভিডিও।

২০১৫ সালে কাডি এক বই লিখেছিলেন *প্রেজেন্স* নামে। সেটা তখন *নিউ ইয়র্ক টাইমস*-এর বেস্ট সেলার।

ঘটনা উলটে যেতে অবশ্য বেশি দিন লাগল না। সেই বছরই কাডির পরীক্ষা রেপ্লিকেট করেছিলেন একদল বিজ্ঞানী। তারা দেখেছেন, পাওয়ার পোজ করে মানুষের মনের জোর বাড়ছে বটে। কিন্তু টেস্টোস্টেরন, কর্টিসল আর ঝুঁকি নেওয়া নিয়ে যেসব কথা বলা হয়েছিল, ওগুলোর প্রমাণ মেলেনি।

মনোবিজ্ঞানের পুরোনো অনেক গবেষণা রেপ্লিকেট করেও দেখা গেছে কোনো কোনো গবেষণার ফল মিলছে না।

১৯৭১ সালে মনোবিজ্ঞানের একটা গবেষণা করেছিলেন ফিলিপ জিম্বার্ডো। সম্ভবত এটা এই শাখার সবচেয়ে বিখ্যাত গবেষণা। মনোবিদ জিম্বার্ডো কয়েকজন তরুণকে দুদলে ভাগ করে একদলকে বানিয়েছিলেন ‘পাহারাদার’, আরেকদলকে ‘বন্দি’। গবেষণার জন্য স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির বেইজমেন্টে এক নকল কারাগারে এদের ১ সপ্তাহ রাখা হবে। কিন্তু জিম্বার্ডো দেখলেন পাহারাদাররা বন্দিদের সাথে খুবই বাজে আচরণ করছে। তাদের সাথে নোংরা ব্যবহার করছে। জিম্বার্ডো বাধ্য হয়ে নির্ধারিত সময়ের আগেই পরীক্ষা শেষ করেন।

মানুষের আচার-আচরণ নিয়ে এরকম আরেকটা পরীক্ষা করেছিলেন স্টেনলি মিলগ্রাম ১৯৬০ সালে। তার পরীক্ষাটা ছিল এরকম—কিছু লোককে একটা শাস্তির কাজ তত্ত্বাবধান করতে হবে। শাস্তিটা হচ্ছে কিছু ‘শিক্ষার্থী’কে বিদ্যুতের শক দেওয়া হবে (শক আর শিক্ষার্থী দুটোই ছিল বানানো। এটা অবশ্য অংশগ্রহণকারীরা জানতেন না)।

ক্ষমতা যে মানুষের স্বভাব বদলে দিতে পারে জিম্বার্ডো আর স্ট্যানলির পরীক্ষা দুটো ছিল তার জলজ্যান্ত প্রমাণ। খারাপ পরিস্থিতিতে একজন নিতান্ত ভালো মানুষও দানব হয়ে উঠতে পারে।

স্ট্যানফোর্ড কারাগার পরীক্ষাটি মনোবিজ্ঞানের প্রায় সব অনার্স-পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের পড়ানো হয়। এই পরীক্ষার কারণে বিশ্বজোড়া খ্যাতি পেয়েছিলেন মনোবিজ্ঞানী ফিলিপ জিম্বার্ডো। ইরাকের আবু গারিব কারাগারে অনেক পাহারাদার অ্যামেরিকান সেনার বিচার হয়েছিল তাদের অপরাধের জন্য। সেই বিচারে জিম্বার্ডো ছিলেন একজন বিশেষজ্ঞ-সাক্ষী। তিনি সেখানে বলেছিলেন, এই পাহারাদার সেনারা বন্দিদের সঙ্গে যে অকথ্য দুর্ব্যবহার করেছে, নির্যাতন করেছে, সেটা তাদের দায়িত্বের ধরনের কারণেই।

স্ট্যানফোর্ড কারাগার পরীক্ষা নিয়ে সন্দেহ তো ছিলই সব সময়। তবে অতি সম্প্রতি করা একটা পরীক্ষা ওই গবেষণার বৈধতাকেই নষ্ট করে দিয়েছে।

২০১৯ সালে গবেষক ও চিত্রনির্মাতা থিবোল্ট লে টেক্সিয়ার একটা গবেষণা-পত্র ছাপিয়েছেন। তার গবেষণার শিরোনাম ছিল 'ডিবাংকিং দা স্ট্যানফোর্ড প্রিজন এক্সপেরিমেন্ট'। তার গবেষণায় একটা টেপের ট্রান্সক্রিপ্ট এসেছে। এখানে দেখা যাচ্ছে জিম্বার্ডো তার পরীক্ষা চালানোর সময় সরাসরি 'গার্ড'-দের বিশেষ নির্দেশনা দিচ্ছেন। কীভাবে কী আচরণ করতে হবে তিনি বলে দিচ্ছেন। এমনকি আচরণগুলো কেমন অমানবিক হবে তা-ও বলে দিচ্ছেন। যেমন : তিনি বলছেন, বন্দিদের যেন টয়লেটও ব্যবহার করতে না দেওয়া হয়।মানে পুরো গবেষণাটি ছিল একটা নাটক। সাধারণ মানুষেরা বিশেষ দায়িত্ব পেলে আসলেই ঠিক কী আচরণ করত তার কিছুই নেই এখানে। অথচ কত কত বছর ধরে গবেষণাটি পুরো বিশ্বে নজর কেড়ে এসেছে। কিন্তু এখন বৈজ্ঞানিকভাবে এটি পুরোই একটি নিরর্থক গবেষণা বলে প্রমাণিত।

এরকম ঘটনা একটা-দুটো ঘটেনি। প্রাইমিং গবেষণার মতো কোথাও কোথাও রেপ্লিকেশন করে ফল মেলেনি। বেমের অলৌকিক আবিষ্কারের মতো কোনো কোনো গবেষণার ফলাফল উদ্ভট। জিম্বার্ডোর পরীক্ষায় দেখলাম অপকৌশল।

স্টেপলের গবেষণার মতো অনেক গবেষণায় উপাত্ত জাল। মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণার এমন নাজুক হাল দেখে মনোবিজ্ঞানীরা আঁতকে উঠলেন। আর কোন কোন গবেষণার এমন অবস্থা? কাদের গবেষণা তা হলে তারা বিশ্বাস করবে?

সমস্যার সমাধানে মনোবিজ্ঞানীদের অনেকে এক হলেন। তারা ঠিক করলেন বড় বড় গবেষণাগুলো তারা একাধিক গবেষণাগারে রেপ্লিকেট করবেন।

মনোবিজ্ঞানের তিনটি শীর্ষস্থানীয় জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা-পত্র থেকে তারা ১০০টা পরীক্ষা বাছাই করলেন। তারা এগুলো রেপ্লিকেট করবেন। ২০১৫ সালে তাদের এসব গবেষণার ফল প্রকাশ হলো *সায়েন্স* ম্যাগাজিনে। দুঃখের বিষয় মাত্র ৩৯% গবেষণা সফলভাবে রেপ্লিকেট করা গেছে।

StackVally

২০১৮ সালে এরকম চেষ্টা হয়েছে আরও একবার। এবার গবেষণা-পত্র নেওয়া হয়েছে দুনিয়ার সবচেয়ে প্রভাবশালী দুই সাময়িকী *নেচার* আর *সায়েন্স* থেকে। সমাজ-বিজ্ঞানের ওপর-করা ২১টি গবেষণা রেপ্লিকেট করে দেখা গেছে সফলতার হার ৬২%। এগুলোর ওপর আরও রেপ্লিকেশন করে দেখা গেছে সফলতার হার ৭৭%, ৫৪%, ৩৮%। যেগুলোর রেপ্লিকেশন সফল হয়েছিল, সেসবের বেলায় আবার দেখা গেছে মূল গবেষণায় ফলাফলের প্রভাব নিয়ে অতিরঞ্জন হয়েছে।

মোদ্দা কথা, রেপ্লিকেশনের সংকট যেন এক ধাক্কায় মনোবিজ্ঞানের প্রায় অর্ধেক গবেষণাকে বাতিল করে দিয়েছে।

***

বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিয়ে এত অনিশ্চয়তার মধ্যে কেন আছি আমরা?

পূর্বাভাসে আমি বলেছি, গায়ে পড়ে রেপ্লিকেশন স্টাডি সাধারণত কেউ করেন না। অর্থনীতিতে মাত্র ০.১% গবেষণা রেপ্লিকেট করার চেষ্টা হয়েছে। মনোবিজ্ঞানের বেলায় অবশ্য একটু ভালো; কিন্তু সেটাও মাত্র ১%। সবাই

নতুন নতুন আবিষ্কারের নেশায় ছুটছেন। পুরোনোগুলোর জোর কত সেটা দেখবে কে?

রেপ্লিকেশন করতে গিয়ে আরেকটা বড় সমস্যা আছে। আপনি হয়তো ভাবছেন, মূল গবেষণা-পত্রে যেসব উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে, একই উপাত্ত নিয়ে কাজ করলে আপনিও একই ফলাফল পাবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য হচ্ছে, বেশিরভাগ বিষয়ে এত সোজাসাপ্টা কাজটা করতেও গবেষকদের মাথার ঘাম পায়ে পড়ে।

দুটো কারণে এমন হতে পারে। একটা হচ্ছে অনেক সময় মূল গবেষণাতেই ভুল হয়। আবার কোনো কোনো সময় বিজ্ঞানীরা তাদের গবেষণা-পত্রে সবকিছু খুঁটিনাটি বলেন না। তারা সংখ্যা নিয়ে ওলট-পালট খেলেন। এগুলো প্রায় সময়ে তারা গবেষণা-পত্র লেখার সময় চেপে যান। পরে যখন অন্য কোনো গবেষক নিজের মতো পরীক্ষা চালান, ফলাফলে মিল পান না। ব্যাপারটা অনেকটা রান্নার বইয়ের মতো। রান্নার বইতে মূল পাচক তো খুব সুন্দর ছবি দিয়ে মুখরোচকভাবে রেসিপি উপস্থাপন করেন। কিন্তু হুবহু ছবির মতো বানাতে যেসব উপায়-উপকরণ লাগবে সেটা ঠিকমতো বলেন না।

ম্যাক্রো-ইকোনমিক্সের ৬৭টা গবেষণা রেপ্লিকেট করার চেষ্টা করা হয়েছিল। একই উপাত্ত ব্যবহার করে মাত্র ২২টার বেলায় একই ফলাফল পাওয়া গেছে। নতুন গবেষকেরা মূল গবেষকের সাহায্য নিয়েও এই সফলতার হার খুব একটা বাড়াতে পারেননি!

ভূ-বিজ্ঞানে ৩৯টা গবেষণার মধ্যে ৩৭টার বেলাতে নতুন গবেষকেরা ফল মেলাতে পারেননি।

'রেকমেন্ডেশন অ্যালগরিদম'-এর ওপর একটা গবেষণা খতিয়ে দেখেছিলেন মেশিন-লার্নিং গবেষকেরা। অ্যামাজন নেটফ্লিক্সের মতো ওয়েবসাইট এই অ্যালগরিদম ব্যবহার করে আপনাকে নতুন নতুন রেকমেন্ডেশন দেয়। তো, এই রকম ১৮টা গবেষণার মধ্যে সব মিলে ফল মিলেছে মাত্র ৭টার।

আপনি বলতে পারেন ওপরের সব পয়েন্ট নিয়েই কি দুশ্চিন্তা করার দরকার আছে? অর্থনীতির বিষয়ে না হয় বুঝলাম—কিন্তু পাওয়ার পোজিংয়ে কনফিডেন্স বাড়ে কি কমে, বা কোন পাখির গায়ে কী রং থাকলে বিপরীত লিঙ্গ আকর্ষণ পায় এসব ব্যাপারে ডজন খানেক বিজ্ঞানী বিরোধিতা করলেই-বা—কী আসে যায়?

দুটো কারণে আসে যায়—

এখানে প্রথমত একটা মূলনীতির ব্যাপার আছে। বিজ্ঞান আমাদের সমাজের জন্য জরুরি জিনিস। কিছু নিম্নমানের গবেষণা দিয়ে আমরা এটা নিয়ে আপস করতে পারি না। বিজ্ঞানের কোনো এক জায়গায় যদি আমরা আদর্শ থেকে সরি, তা হলে পুরো বিজ্ঞান-জগতেরই সুনাম ক্ষুণ্ন হবে।

বিজ্ঞানের এমন একটা শাখা আছে, ওখানকার গবেষণা যদি রেপ্লিকেট করা না যায়, তা হলে এর প্রভাব হতে পারে ভয়ানক। বলুন তো আমি কোন শাখার কথা বলছি?

জি, আমি চিকিৎসা-বিজ্ঞানে গবেষণার কথা বলছি।

ক্যান্সার নিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ের কিছু গবেষণা খতিয়ে দেখেছিল অ্যামজেন (Amgen) নামে এক বায়োটেক কোম্পানি। (প্রাথমিক পর্যায়ের গবেষণা হয় ইঁদুরের শরীরে বা কৃত্রিমভাবে মানুষের কোষে)। এসব গবেষণা ছাপা হয়েছিল শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞান-পত্রে। পরীক্ষাগুলো হুবহু করে অ্যামজেন মাত্র ৬টা পরীক্ষায় সফল হয়েছিল—মোট গবেষণার মাত্র ১১%। বেয়ার (Bayer) নামে আরেকটি কোম্পানির সাফল্যের হার একটু বেশি—২০%—কিন্তু তারপরও আশানুরূপ হয়নি। এক জরিপে দেখা যায় ক্যান্সার নিয়ে গবেষণার সাকুল্যে ৩.৪% গবেষণা প্রাথমিক পর্যায় থেকে মানবদেহে ব্যবহারের অনুমতি পায়।

গবেষণা রেপ্লিকেট করার এই দুরবস্থা দেখে ক্যান্সার গবেষকেরা তাদের ক্ষেত্র নিয়ে চিন্তায় পড়েন। ২০১৩ সালে তারা সম্মিলিতভাবে বিভিন্ন গবেষণাগারে

প্রাথমিক-পর্যায়ের ৫১টি জরুরি গবেষণা রেপ্লিকেট করার সিদ্ধান্ত নেন। এরকম একটা গবেষণার মধ্যে ছিল, কলোরেক্টাল ক্যান্সারে টিউমার বাড়ার জন্য নির্দিষ্ট এক ব্যাক্টেরিয়াম দায়ী। আরেক গবেষণায় বলা হয়েছিল, লিউকোমিয়ার মধ্যে যে মিউটেশন পাওয়া গেছে সেটার জন্য নির্দিষ্ট কিছু এনজাইম দায়ী।

মজার ব্যাপার হলো, তারা গবেষণা রেপ্লিকেট করবেন কি—শুরুই করতে পারছিলেন না। কারণ, মূল গবেষণা-পত্রে পরীক্ষাগুলো পুনরায় করার জন্য যথেষ্ট তথ্য নেই। কোষের ঘনত্ব আর পরিমাপের অন্যান্য দিক-সহ জরুরি অনেক কথাই লাপাত্তা।

গবেষকেরা তখন মূল গবেষকদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। মূল গবেষকদের কেউ কেউ তাদের পুরোনো খাতাপত্র ঘাঁটতে লাগলেন। অনেকে তাদের সহকারী-সহকর্মীদের খুঁজতে লাগলেন—সবাই তো আর এক জায়গায় নেই তখন। কেউ কেউ আবার সহযোগিতাও করতে রাজি হননি। রেপ্লিকেট করতে চাওয়া গবেষকেরা রিপোর্ট করেছেন, কম করে হলেও ৪৫% মূল গবেষক খুব সামান্য সহযোগিতা করেছেন বা করেনই-নি কেউ কেউ। সম্ভবত তাদের অনেকে রেপ্লিকেটকারীদের যোগ্যতার ব্যাপারে আশ্বস্ত ছিলেন না। অথবা ভেবেছেন, যদি রেপ্লিকেট করে ফল না মেলে, তা হলে তারা ভবিষ্যতে গবেষণায় হয়তো আর ফান্ড পাবেন না।

জীব-চিকিৎসাবিজ্ঞান (Biomedical) শাখার ২৬৮টি গবেষণা-পত্র দৈবচয়ন করে রেপ্লিকেট করার চেষ্টা হয়েছিল একবার। মজার ব্যাপার এখান থেকে মাত্র ১টা গবেষণাই পুরোপুরি হুবহু রেপ্লিকেট করা গেছে। অন্যগুলো রেপ্লিকেট করা যায়নি। কারণ, ওগুলো রেপ্লিকেট করার জন্য যথেষ্ট তথ্য গবেষণা-পত্রে উল্লেখ ছিল না।

আরেকটা বিশ্লেষণ বলছে জীব-চিকিৎসাবিজ্ঞানের ৫৪% গবেষণায় পুরোপুরি বলা থাকে না কোন ধরনের প্রাণী, রাসায়নিক দ্রব্য বা কোষ ব্যবহার করা হয়েছে পরীক্ষায়।

পুরো বিষয়টা যে কী অদ্ভুত ভাবুন একবার! একটা গবেষণা-পত্র লেখাই হচ্ছে এমনভাবে যেটা রেপ্লিকেট করতে মূল গবেষকদের সাথে চিঠি চালাচালি করতে হবে মাসের পর মাস। তা হলে এমনভাবে গবেষণা-পত্র লেখারই কী দরকার ছিল?

বিজ্ঞানীরা কেন তাদের গবেষণা অন্যদের জানাবে? এর মূল উদ্দেশ্য কী ছিল? ১৭ শতকে রবার্ট বয়েলের কাছে ফিরে যাই। বিজ্ঞানীরা তাদের গবেষণা জানাবেনই তো এজন্য যাতে অন্যরা সেটা খতিয়ে দেখতে পারে, রেপ্লিকেট করতে পারে। আমাদের এসব গবেষণা-পত্র প্রাথমিক পরীক্ষাতেই ব্যর্থ। বিজ্ঞান সাময়িকীগুলোও ব্যর্থ তাদের বুনিয়াদি সমালোচনা কাজে।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানে রেপ্লিকেশনের সমস্যা কিন্তু শুধু গবেষণাগারের প্রাথমিক পর্যায়ের গবেষণায় আটকে নেই। ডাক্তাররা যে তাদের রোগীকে চিকিৎসা দিচ্ছেন, কখনো কখনো সেখানেও সরাসরি প্রভাব পড়ছে। দেখা যাচ্ছে অনেক চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে দুর্বল গবেষণার বরাতে। চিকিৎসার যেসব জ্ঞান স্বীকৃত, সেসবের বিরোধী কথাবার্তাকে আমলে নেওয়া হচ্ছে নতুন অথচ কমজোরি গবেষণা দিয়ে। এই ঘটনা এত বেশি ঘটছে যে, চিকিৎসা-বিজ্ঞানী বিনয় প্রসাদ আর অ্যাডাম শিফু তো এর একটা নামও দিয়েছেন—'মেডিকেল রিভার্সাল'।

এরকম একটা মেডিকেল রিভার্সালের উদাহরণ হচ্ছে 'অ্যানেস্থেশিয়া অ্যাওয়ারনেস'। মানে, অপারেশন চলা অবস্থায় রোগীর হুঁশ ফেরা। ঘটনাটা বিরল, কিন্তু যখন হয় খুবই ভয়ংকর। যখন এরকম হয়, রোগী কাটাকাটির ভয়ানক ব্যথা পান; কিন্তু কিছু বলতে পারেন না, শরীর নড়াচড়াও করতে পারেন না।

৯০-এর দশকে একটা গবেষণা করে বলা হয়েছিল 'বাই-স্পেকট্রাল ইনডেক্স মনিটর' ব্যবহার করলে এরকমটা আর হবে না। অ্যানেস্থেশিয়া দেওয়ার পর যন্ত্রটা রোগীর খুলিতে লাগানো থাকবে। সার্জনরা তখন মনিটর দেখে নিশ্চিত হতে পারবেন রোগী পুরোপুরি অজ্ঞান কি না।

এই গবেষণার কারণে ২০০৭ সালের মধ্যে অ্যামেরিকার প্রায় অর্ধেক অপারেশন থিয়েটারে এই মনিটর বসানো হয়েছিল। দুনিয়াজোড়া এই মনিটর বসে গিয়েছিল প্রায় ৪ কোটি অপারেশন থিয়েটারে।

২০০৮ সালে বড় পরিসরে এই বিষয়ে গবেষণা করে দেখা যায় আগের গবেষণার ফলাফলে ঘাপলা ছিল। মনিটর লাগানোর পরও রোগীদের 'অ্যানেস্থেশিয়া অ্যাওয়ারনেস' হয়েছে। অথচ মনিটরে নাম্বার দেখাচ্ছিল রেঞ্জের মধ্যে।

২০১৯ সালে প্রসাদ সিফু আর তার সহকর্মীরা মিলে একটা রিভিউ চালান। শীর্ষ ৩ মেডিকেল জার্নাল থেকে তারা বেছে নিয়েছিলেন হাজার তিনেকেরও বেশি গবেষণা-পত্র। রিভিউতে তারা ৩৯৬টা গবেষণা পেয়েছেন যেগুলোতে সম্মতি-থাকা চিকিৎসা-পদ্ধতির বিপরীত কথা ছিল। কিছু উদাহরণ দেখুন :

নবজাতক জন্ম : পুরাতন কিছু গবেষণা বলেছিল গর্ভে জমজ বাচ্চা থাকলে সিজার করা নিরাপদ। গবেষণার কারণে দেখা যেত জমজ বাচ্চা থাকলেই মায়েদের সিজার করা হতো—অন্তত উত্তর অ্যামেরিকায়। ২০১৩ সালে এই বিষয়ের ওপর আরও বিশাল আকারে গবেষণা হয়। গবেষণায় দেখা যায় সিজার করা না-করার সাথে জমজ বাচ্চার স্বাস্থ্যের ভালো-খারাপের কোনো সম্বন্ধ নেই।

অ্যালার্জি : বাদামের অ্যালার্জি খুবই ভয়ংকর। বাবা-মা'র যদি এই অ্যালার্জি থাকে বাচ্চারও এই অ্যালার্জি হবার আশঙ্কা অনেক। এজন্য ঝুঁকির-শঙ্কায়-থাকা বাচ্চাদের ৩ বছর বয়স পর্যন্ত বাদাম এড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হতো। একটা লম্বা সময় ধরে অতীত গবেষণার আলোকে এরকমটা হয়ে আসছিল। যেসব মায়েরা বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ান, তাদেরও বাদাম খেতে মানা করা হতো। ২০১৫ সালে উন্নতমানের একটি গবেষণায় দেখা যায়, বিষয়টা যতটা ঝুঁকিপূর্ণ ভাবা হতো আগে, ততটা নয়। বাচ্চারা যদি অল্প বয়স থেকে বাদাম খাওয়া শুরু করে, ৫ বছর বয়স হতে হতে মাত্র ২% বাচ্চার মধ্যে অ্যালার্জি হবার ঝুঁকি থাকে।

হার্ট অ্যাটাক : ছোট ছোট কিছু গবেষণা থেকে বলা হয়েছিল রোগীকে তুলনামূলক ঠান্ডায় রাখলে তার বাঁচার সম্ভাবনা বাড়ে। প্যারামেডিক নির্দেশনাতেও পরে এই পরামর্শ যোগ করা হয়। কিন্তু ২০১৪ সালে বড় আকারের গবেষণা করে দেখা যায়, তাপমাত্রা কমানোর সাথে রোগীর বাঁচার সম্ভাবনা বাড়ার কোনো সম্পর্ক নেই। বরং তাপমাত্রা কমানো হলে হাসপাতালে যেতে যেতে রোগীর দ্বিতীয়বার হার্ট অ্যাটাক হবার আশঙ্কা বাড়ে।

স্ট্রোক : কিছু গবেষণা বলছিল, স্ট্রোকের পর রোগীর অবস্থার উন্নতির জন্য তাকে নড়ানো-চড়ানো গেলে ভালো। এসব গবেষণার নির্দেশনা পরে বেশিরভাগ হাসপাতালের গাইডলাইনে যোগ করা হয়। ২০১৫ সালে এটা নিয়ে বড় ধরনের একটা গবেষণা হয়। তখন দেখা যায়—এতে বরং স্ট্রোকে আক্রান্ত রোগীর অবস্থা আরও খারাপ হয়। ২০১৬ সালের এক গবেষণা দেখিয়েছে, স্ট্রোকের রোগীকে প্লাটিলেট ট্রান্সফিউশন করালে অবস্থা ভালো হবার বদলে খারাপ হয়।

Stack Valy

সত্যি বলতে, ডাক্তারদের আর যারা চিকিৎসার গাইডলাইন লেখেন তাদের কখনো কখনো নিম্নমানের গবেষণার ওপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় থাকে না। কারণ, দেখা যায় ওসব ছাড়া আর বিকল্প কিছু নেই।

এখন প্রযুক্তি উন্নত, কর্মপদ্ধতি উন্নত। আগের চেয়ে এখন এই খাতে ফান্ডিং-ও বেশি। এসব কারণে বিজ্ঞানীদের আগের চেয়ে ভালো গবেষণা করতে পারার কথা। কিন্তু বিজ্ঞানীরা লাগাতার নিম্নমানের গবেষণা করে করে ডাক্তার আর রোগী দুই দলকেই ভুক্তভোগী করছেন। কখনো কখনো অনার্স-পড়ুয়া স্টুডেন্টরাই এসব গবেষণার ঘাপলা ধরে ফেলে। আমরা নিজেরাই তো বেশ কয়েকটা গবেষণা প্রকাশের সময়ে জানতাম কীভাবে এটাকে আরও ভালো করা যায়; কিন্তু আমরা করিনি।

পর্ব ২

ভুল আর কলঙ্ক

৩. জোচ্চুরি

ইন্টারনেটের কিছু কিছু ভিডিও আমাদের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। আমরা দেখি, লোকজন বিশেষ কোনো শারীরিক সমস্যা বা অসুখে ভুগছেন। হঠাৎ নতুন কোনো প্রযুক্তি, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের নয়া কোনো আবিষ্কার তাদের জীবন পালটে দিচ্ছে। যেমন ধরুন : যেসব বাচ্চারা কানে শুনতে পারে না—ককলার ইমপ্ল্যান্টের কারণে প্রথমবার যখন তারা শুনতে পারে, তাদের হাসিমুখগুলো বলার মতো নয়। তারপর ধরুন যেসব শিশু চোখে ছানি নিয়ে জন্মায়—দেখতে পায় না। অপারেশনের পর তার প্রথম দেখার অনুভূতি কি ভাষায় প্রকাশ করা যায়? এরপর ধরুন যুদ্ধে পা হারানো সৈনিক যখন কৃত্রিম পা দিয়ে ফের হাঁটতে পারে—সে কী আনন্দ। এসব ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তুমুল জনপ্রিয়। লোকজন এসব ভিডিও দেখতে পছন্দ করে। এসব ভিডিও মানুষকে উচ্ছ্বসিত করে। বিজ্ঞান যে কী চমৎকারভাবে আমাদের স্বাস্থ্য, আমাদের জীবন উন্নত করতে পারে তার বাস্তব নজির এসব ভিডিও।

কিন্তু বিজ্ঞানের এ-ধরনের আবিষ্কার নিয়েও জোচ্চুরি হয়। এরকমই একটি ঘটনায় এক রোগী ভাবছিলেন তারও জীবন পালটে যাচ্ছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই রোগী শতাব্দীর অন্যতম এক জোচ্চুরির শিকার হলেন। তা-ও আবার এই জোচ্চুরি কোনো হাতুড়ে ডাক্তারের কর্ম নয়। এমন নয় যে অনলাইনে মরিয়া হয়ে চিকিৎসা খুঁজছেন এমন কেউ এই ভণ্ডামির কবলে পড়েছেন। এই জোচ্চুরি হয়েছে দুনিয়ার শীর্ষস্থানীয় এক মেডিকেল কলেজ থেকে। যে-গবেষণার জেরে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছিল সেই গবেষণাও ছাপা হয়েছিল

নামকরা সায়েন্টিফিক জার্নালে। এই ঘটনা থেকে বুঝবেন—জোচ্চোরেরা কী সুন্দর আমাদের নাকের সামনে দিয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছে!

মানুষের শ্বাসনালীতে মারাত্মক অসুখ হলে বা ওখানে কোনো ইনজুরি হলে ডাক্তাররা সেটা আর সারাতে পারেন না। তখন রোগীকে বাঁচাতে হলে একদম নতুন শ্বাসনালী লাগে। কিন্তু সেই কাজটাও বেজায় কঠিন। জীবিত মানুষ তো আর নিজের শ্বাসনালী অন্যকে দিতে পারবেন না। এজন্য লাগবে মরা মানুষের শ্বাসনালী। কিন্তু তারপরও সমস্যা আছে। দাতা আর গ্রহীতার মধ্যে জিনগত পার্থক্য থাকলে গ্রহীতার শরীর সেই শ্বাসনালী নিতে পারে না। ডাক্তাররা এজন্য নকল শ্বাসনালীর ব্যবস্থা করেছিলেন। এসব বানানো হয় প্লাস্টিক, জং-ধরে-না এমন স্টিল, কোলাজেন এমনকি কাচ দিয়েও। কিন্তু সাধারণত নকল শ্বাসনালী দিয়েও সমস্যা সারে না। এগুলো নড়ে যায়, শ্বাসনালীর রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। অনেক সময় ইনফেকশনও হয়। ২১ শতাব্দীর শুরুতে ডাক্তারা সিদ্ধান্তে এলেন—নকল শ্বাসনালী দিয়ে সমাধান অসম্ভব।

পাওলো ম্যাকিয়ারিনি নামের এক ইতালিয়ান সার্জন ইতিহাস-তৈরি-করা এক পেপার নিয়ে এলেন ২০০৮ সালে। তার গবেষণা-পত্র ছাপা হলো টপ মেডিকেল জার্নাল *দা ল্যানসেট*-এ। শ্বাসনালীর সফল প্রতিস্থাপনের কাজ তিনি পেরেছেন বলে দাবি করলেন এই গবেষণা-পত্রে। তিনি বললেন, শ্বাসনালী বসানোর আগে ওটায় গ্রহীতার স্টেম সেলের একটা স্যাম্পল রাখা হবে। ওটা তখন বীজের মতো কাজ করবে। স্টেম সেল একটার পর একটা বিভাজিত হতেই থাকে। শরীরের অন্যান্য কোষকে সারায়, বদলায়। তিনি দেখালেন, এই অবস্থায় বিশেষভাবে নকশা করা ইনকিউবেটরে কিছু সময় রাখার পর গ্রহীতার স্টেম সেল দাতার শ্বাসনালীতে 'উপনিবেশ' স্থাপন করে। এতে পরে আর গ্রহীতার শরীর ওই শ্বাসনালী প্রতিস্থাপন করলে বেঁকে যায় না।

ম্যাকিয়ারিনির এই আবিষ্কার সত্যিই অভূতপূর্ব। কিন্তু দাতা ছাড়া কীভাবে শ্বাসনালী বদলানো যায়? এটাই ছিল বিজ্ঞানীদের আসল লক্ষ্য। ম্যাকিয়ারিনির আইডিয়া থেকে কি ওরকম লক্ষ্য অর্জন সম্ভব?

ম্যাকিয়ারিনি নিজেই এর জবাব খুঁজে পেলেন। ২০০৮ সালের তার সেই যুগান্তকারী আবিষ্কারের পর সার্জন হিসেবে তার সুনাম অনেক বেড়েছে। ২০১০ সালে সুইডেনের কারোলিন্সকা ইনস্টিটিউটে তিনি নিয়োগ পেলেন। এই সেই ইন্সটিটিউট, যেখানে ফিজিওলজি বা মেডিসিনের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। ম্যাকিয়ারিনির মতো সার্জনের আদর্শ কর্মক্ষেত্র এটা ছাড়া আর কোথায় হতে পারে?

২০১১ সালের জুলাই মাসে ইনস্টিটিউট থেকে বড় ঘোষণা এল। ম্যাকিয়ারিনি সফলভাবে কৃত্রিম শ্বাসনালী প্রতিস্থাপন করেছেন এক ক্যান্সার রোগীর শরীরে। কৃত্রিম শ্বাসনালীটা কার্বন-সিলিকনের। গাছে যেভাবে 'কলম' করে অনেকটা ওরকমভাবে গ্রহীতার স্টেম সেলের স্যাম্পল দিয়ে কৃত্রিম শ্বাসনালী স্থাপন করা হয়েছে। অপারেশনটা হয়েছে কারোলিনস্কা হাসপাতালে।

ওই বছরের নভেম্বর মাসে একটা গবেষণা-পত্রে অপারেশনের বিস্তারিত বিবরণ ছাপা হয়েছে। তত দিনে হাসপাতালের আরেক রোগীর শ্বাসনালীর অপারেশন হয়। এটার কথাও গবেষণা-পত্রের আকারে প্রকাশিত হয় *দা ল্যানসেট* সাময়িকীতে। বলা হয় 'মজবুত প্রমাণ' মিলেছে। ২০১২ সালে ম্যাকিয়ারিনি আরও তিনজন রোগীর শরীরে কৃত্রিম শ্বাসনালী বসান। এদের একজনের অপারেশন হয়েছে ইনস্টিটিউটে। আর বাকি দুটো হয়েছে রাশিয়ার ক্রাসনোদারে। পরের দুবছরে রাশিয়াতে তিনি আরও দুটো সফল অপারেশন করেন। একের পর এক গবেষণা-পত্র ছাপিয়ে সুখবর জানাতে থাকেন ম্যাকিয়ারিনি।

২০১৪ সালে *বায়োমেটেরিয়ালস* জার্নালে ম্যাকিয়ারিনির এক গবেষণা-পত্রে 'ইলেক্ট্রোস্পান ট্রাকিয়াল স্ক্যাফোল্ড'-এর সুন্দর সুন্দর ছবি দেওয়া হয়েছিল। ছবি দিয়ে দুয়েক কথায় বলা হয়েছিল প্রথম রোগী কিছু জটিলতার মুখে পড়েছিলেন। তারপর চট করে প্রসঙ্গ এড়িয়ে নতুন প্রযুক্তির গুণগান গাওয়া শুরু হয়। কিন্তু ওখানে তারা ভয়ংকর একটা তথ্য চেপে গেছেন—ওই রোগী মারা গেছেন। এই গবেষণা-পত্র ছাপার অনুমতি পাবার ৭ সপ্তাহ আগেই!

দ্বিতীয় অপারেশনের রোগী তো আরও দ্রুত মারা গেছেন। অপারেশনের মাত্র ৩ মাসের মাথায়। কারোলিন্সকার তৃতীয় রোগীকে প্রথম অপারেশনের পর আরও কিছু অপারেশনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। কিন্তু তারপরও তিনি বাঁচেননি। তিনি মারা গেছেন ২০১৭ সালে। রাশিয়ার রোগীরও একই অবস্থা—অবশ্য তিনি অন্যদের চেয়ে একটু বেশি বেঁচেছেন। তার নাম ছিল জুলিয়া তুলিক। তিনি ছিলেন সেন্ট পিটার্সবার্গের এক ব্যালে ড্যান্সার। এক সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তিনি তার দুর্দশার কথা জানিয়ে বলেছেন,

> "আমার সাথে খুবই খুবই খারাপ হয়েছে। ক্রাসনোদার হাসপাতালে ৬ মাসেরও বেশি সময় কাটাতে হয়েছে আমাকে। এই সময়ে আমার অপারেশন হয়েছে ৩০ বার! এতবার অ্যানেস্থেসিয়া ঢুকেছে আমার শরীরে! প্রথম অপারেশনের মাত্র ৩ সপ্তাহ পর পুঁজে-ভরা ক্ষত তৈরি হয়েছিল। সেদিন থেকে আমার ঘাড় যেন পচে গেছে। আমার ওজন এখন ৪৭ কেজি। হাঁটতে পারি না। শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। গলা দিয়ে স্বরও বের হয় না। ওই ক্ষত থেকে এত গন্ধ...লোকজন দূরে সরে যায় আমার থেকে।"

২০১৪ সালে তুলিক মারা যান। তার অপারেশনের দুই বছরের মাথায়। অথচ অপারেশনের আগে তার জীবন মোটেও কোনো শঙ্কার মধ্যে ছিল না—কী মর্মান্তিক!

রাশিয়ান আরেক রোগীর মৃত্যু 'সাইকেল দুর্ঘটনায়' হয়েছিল বলে বলা হয়েছে। আরেকজন মারা গেছেন অপারেশনের ১ বছর পর। তার মৃত্যুর কারণ অজানা। তৃতীয়জন বেঁচেছেন, তবে সেটা ওই কৃত্রিম শ্বাসনালী সরানোর পর।

২০১৩ সালে ম্যাকিয়ারিনি ইলিয়নসের পিয়োরিয়াতে একটি হাসপাতালে এক বাচ্চার শ্বাসনালীর অপারেশন করেছিলেন। অপারেশনটা নিয়ে মিডিয়ার ভালো নজর ছিল। অপারেশনের বাচ্চাটাও বেশি দিন বাঁচেনি। কয়েক মাস পর মারা যায়।

কারোলিনস্কা হাসপাতালে ম্যাকিয়ারিনির অপারেশনের পর যেসব ডাক্তার রোগীদের দেখাশোনা করতেন, তাদের চোখে অসংগতি ধরা পড়ল। গবেষণা-পত্রে যতটা ফলাও করে বলা ছিল, বাস্তবে রোগীদের স্বাস্থ্যের অবস্থা তত ভালো ছিল না। তারা কারোলিনস্কা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে বিষয়টা জানালেন। মজার ব্যাপার হলো, বিষয়গুলো সুরাহা করবে কী, প্রতিষ্ঠান থেকে উলটো তাদের চেপে যেতে বলা হলো! এখানেই শেষ নয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ডাক্তারদের ব্যাপারে পুলিশকে নালিশ জানাল। বলল, তারা রোগীদের চিকিৎসার রেকর্ড পর্যালোচনা করে তাদের গোপনীয় তথ্যে হাত দিয়েছেন। এই অভিযোগ অবশ্য ধোপে টেকেনি।

শেষমেশ চাপে পড়ে ইনস্টিটিউট স্বাধীনভাবে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে দিতে রাজি হয়। তারা এই কাজে ডেকে পাঠান কাছেরই উপসালা ইউনিভার্সিটির এক অধ্যাপককে।

২০১৫ সালের মে মাসে সেই গবেষক একটা প্রতিবেদন পেশ করেন। প্রতিবেদনটি ছিল প্রায় হাজার বিশেক শব্দের। সেখানে তিনি পরিষ্কার ভাষায় লিখেছেন, ম্যাকিয়ারিনি একাধিক জায়গায় 'বৈজ্ঞানিক অসদাচরণ-দোষে দোষী' (guilty of scientific misconduct)। সাতটা গবেষণা-পত্রে ম্যাকিয়ারিনি একাধিক ভুল করেছেন। রোগীর অবস্থা ভালো হচ্ছে বলে তিনি মিথ্যা দাবি করেছেন প্রয়োজনীয় চেক-আপ না করেই। ফলো-আপের বিষয়ে বিকৃত তথ্য দিয়েছেন যাতে মনে হয় রোগীরা বেশি দিন ধরে সুস্বাস্থ্যে আছেন। রোগীরা যেসব জটিলতায় ভুগছিলেন, তাদের যে আরও অপারেশন করতে হচ্ছিল—এসব তথ্য ম্যাকিয়ারিনি বেমালুম চেপে গেছেন। মানুষের ওপর মেডিকেল এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে তিনি নৈতিক অনুমোদন নিতে ব্যর্থ হয়েছেন। ইঁদুরের শ্বাসনালী বদলাতে গবেষণাগারে যে তথ্য পেয়েছেন তিনি সেটার ভুয়া বিবরণ দিয়েছেন।

অনেকে নিশ্চয়ই ভাবছেন এরপর কোনো শুভ পরিণতি হবে।

না, পাঠক, আপনি ভুল ভাবছেন।

ম্যাকিয়ারিনি তার ওপর আরোপিত অভিযোগের ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া জানালে কারোলিনস্কা ইনস্টিটিউট নিজেরা এবার অনুসন্ধান চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়। ২০১৫ সালে অপ্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে তারা বলেন, কোনো বৈজ্ঞানিক অসদাচরণ হয়নি। এর পরের সপ্তাহেই *দা ল্যানসেট* জার্নাল এই খবর প্রচার করল এই শিরোনামে, 'পাওলো ম্যাকিয়ারিনি বৈজ্ঞানিক অসদাচরণের দায়ে দোষী নন'। বড় বড় দুই মেডিকেল ইনস্টিটিউশন ম্যাকিয়ারিনিকে অভিযোগ থেকে সাফাই করল।

২০১৬ সালের চোরের দশ দিনের পর গৃহস্থের এক দিন এল।

ম্যাকিয়ারিনিকে নিয়ে একটা ডকুমেন্টারি প্রচারিত হলো। ডুকেমেন্টারির নাম ছিল 'দা এক্সপেরিমেন্ট'। সুইডিশ এক টিভি চ্যানেল তিন পর্বে এটা প্রচার করেছিল। ডকুমেন্টারিটি দেখায়—ম্যাকিয়ারিনির রোগীদের জীবন কীভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে, কেউ কেউ তো মারাও গেছে তার অযোগ্যতার বলি হয়ে। ডকুমেন্টারিতে ব্রঙ্কোস্কোপি নিয়ে একটা ফুটেজ ছিল। ওটা ছিল কারোলিনস্কা হাসপাতালে শ্বাসনালী প্রতিস্থাপিত হওয়া এক রোগীর। ফুটেজে দেখা যায় রোগীর শ্বাসনালীতে কোথাও ক্ষত, কোথাও ছিদ্র, কোথাও-বা শ্বাসনালীর পথ বন্ধ। অথচ *দা ল্যানসেট*-এর গবেষণা-পত্রে ম্যাকিয়ারিনি কী চমৎকারভাবে 'প্রায় স্বাভাবিক শ্বাসপথ'-এর দাবি করেছিলেন।

বাধ্য হয়ে কারলিনস্কা ইউনিভার্সিটি নতুন করে তদন্ত শুরু করল। চাকরি গেল অনেকের। ম্যাকিয়ারিনির ব্যাপারে শুরু থেকেই সমর্থন দিচ্ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর। তিনি পদত্যাগ করলেন। তার পর পদত্যাগ করলেন গবেষণার ডিন। তারপর ইউনিভার্সিটি বোর্ডের চেয়ারম্যান। ম্যাকিয়ারিনির নিয়োগের জন্য নোবেল কমিটির একজন সদস্য সুপারিশ করেছিলেন। তিনিও বাধ্য হয়ে পদত্যাগ করলেন।

২০১৬ সালের মার্চ মাসে অবশেষে বরখাস্ত হলেন ম্যাকিয়ারিনি। তত দিনে প্রথম ব্যর্থ অপারেশনের সাত বছর পার হয়ে গেছে। গত কয়েক বছর *দা ল্যানসেট* জার্নাল ম্যাকিয়ারিনিকে সব সময় সুরক্ষা দিয়ে গেছে। কিন্তু এবার

তারাও সরে আসে। কৃত্রিম শ্বাসনালী প্রতিস্থাপন বিষয়ে ম্যাকিয়ারিনির সব গবেষণা-পত্র তারা তুলে নেয়।

বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৮ সালের মাঝামাঝি জানায়, তারা ম্যাকিয়ারিনির আরও কিছু গবেষণায় বৈজ্ঞানিক কদাচার পেয়েছে। ওগুলো অনলাইনে ছিল। তারা সেগুলোও প্রত্যাহার করেছে।

বরখাস্ত হবার পর ম্যাকিয়ারিনি চলে যান রাশিয়াতে। সেখানে গিয়ে তিনি খাদ্যনালী নিয়ে নতুন করে গবেষণা শুরু করেন। কপাল ভালো, এবার আর তার গবেষণায় কোনো রোগী জড়িত ছিল না।

ম্যাকিয়ারিনি এখন কী হালে আছেন তা অনিশ্চিত। রাশিয়ান সরকার ২০১৭ সালের মাঝামাঝি তাকে অর্থকড়ি দেওয়া বন্ধ করে দেয়। তার পক্ষে এখন আর কোনো অপারেশন করতে পারার কথা নয়।

২০১৮ সালে সুইডিশ প্রসিকিউশন কর্তৃপক্ষ ঘোষণা দিয়েছিল, তারা মানুষ হত্যার অভিযোগে ম্যাকিয়ারিনির বিরুদ্ধে তদন্ত করবে।

এখন কথা হচ্ছে, সবকিছু হতে এত সময় লাগল কেন? কেন এতগুলো মানুষের জীবন যাবার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের টনক নড়ল? আর ওদিকে যারা ম্যাকিয়ারিনির জোচ্চুরি ফাঁস করলেন, উলটো তারাই কিনা পড়লেন রোষানলে!